Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.152-158
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রতিবাদী সত্তায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা: একটি বিশ্লেষণী পাঠ

রাজেশ বিশ্বাস

বিংশ শতকের চল্লিশ দশকের কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একদিকে মানব দরদী অন্যদিকে প্রতিবাদী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হলেও শৈশব থেকেই গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বেশির ভাগ কবিতার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাষা। অন্যায়কে তিনি কখনো আপস করেন নি। জীবনে চলার পথে যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন, সেখানেই তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রতিবাদের ভাষা। আর এই প্রতিবাদের ভাষাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন তাঁর করিতায়। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তে-ভাগা আন্দোলন, ১৯৫৯ থেকে খাদ্য আন্দোলন, চীন-ভারতের যুদ্ধ, পুলিশ ও মহাজনদের অত্যাচার, মে দিবসের রক্তাক্ত ইতিহাস তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা সমসাময়িক কালের দলিল; আবার বলা যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রতিবাদের অস্ত্র। যে কারনে হয়তো শঙ্খ ঘোষ বীরেন্দ্র সমগ্রে, ১ম খণ্ডের সূচনায় বলেছেন- "সমস্ত অর্থেই বাংলার সবচেয়ে প্রতিবাদী এই কবি; তাঁর কবিতা যেন আমাদের সামনে একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরে, আমাদের হৃদয়ের ইতিহাস আর আমাদের সময়ের ইতিহাস"। যন্ত্রনাদগ্ধ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানব দরদী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাম্যবাদী আদর্শে নতুন এক ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। যারা আকাশ বিষাক্ত করে, জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায় ক্রমে অন্ধকার করে, চারিদিকে ষড়যন্ত্র করে; তাদের উদ্দেশে কবি "আমার ভারতবর্ষ" করিতায় উল্লেখ করেছেন–

"আমার ভারতবর্ষ চেনেনা তাদের
মানেনা তাদের পরোয়ানা
তাঁর সন্তানেরা ক্ষুধায় জ্বালায়, শীতে চারিদিকের প্রচণ্ড মারের মধ্যে
আজও ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর।"

কৈশোরকাল থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারা স্পষ্ট হতে থাকে এবং ১৯৪২ এ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ এবং পার্টির বিভাগ কবিকে আন্দোলিত করে এবং তাঁর ফলে কবির মধ্যে জেগে ওঠে প্রতিবাদী স্বভাব। এ প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভূমিকায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যাইয়ের বক্তব্য- "অনুভব কোন প্রশ্নের উত্তর নয়। সময়, স্বদেশ, মনুষ্যত্ব - কবি কবিতা, কবিতার পাঠক - কোথাও যদি এক্সুত্রে বাঁধা যেতো ? হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত। "আর এই অনেক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে উঠে এসেছে প্রতিবাদের ভাষা, সুর, আদল। মানুষের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এই অনেক প্রশ্ন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শোষিত, লঞ্চিত, অবহেলিত, বুভুক্ষ, নিরন্ন মানুষদের ন্যূনতম অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের - অভাব দেখে কবির কলমে উঠে এসেছে প্রতিবাদ।

শতবর্ষে পরেও আজ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা কেন পাঠ্য ? আজকের সামাজিক অবস্থা, মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা-সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা আসে যায়' কবিতার কয়েকটি পংক্তি এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে–

"রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
..... দিন বদলায় না।

সত্যিই! দিন যেন বদলায় নি। জীবনে যাপনে সমাজে সভ্যতায় সাধারন মানুষকে আজও যে অত্যাচারের, অবিচারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা পাঠককে অবগত করার অবকাশ নেই। 'রাজনীতি' শব্দের অর্থ রাজার নীতি। কিন্তু এই নীতি যখন রাজতন্ত্রের, পুঁজিবাদীদের, শাসক সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারন মানুষের জন্য সহজ, সরল স্পষ্ট এবং নিরপেক্ষ হবে তখনই তা দেশের, সমাজের, সভ্যতার জন্য ইতিবাচক হয়ে উঠবে। অথচ আজকের রাজনীতি বলা যায় দলীয় সিংহাসন লাভের একমাত্র মাধ্যম। আর যে কারনেই আমাদের সমাজে আজ সবকিছু থাকা সত্ত্বেও না পাওয়ার বেদনা মাথা চারা দিয়ে ওঠে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পোশাক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারের নামে চলে প্রহসন। শোষিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত মানুষদের জন্য কবি তাই আক্ষেপ করেন। আবার এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদী মানুষের যে ভীষণ অভাব তাঁর প্রমান "মহাদেবের দুয়ার" কবিতা–

"যারা কথা বলছে তারা বোবা
যারা শুনছে সকলেই
জন্ম থেকে বধির। অথচ
সভায় মিছিলে তিলধারণের ঠাঁই নেই।
যারা উপস্থিত তারা বহুদিন মৃত
কিন্তু সকলেই হাততালি দিচ্ছে …'

মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। নিজের প্রাপ্যটুকু দাবী করার সাহস যেন মানুষের নেই। প্রাসঙ্গিকতায় 'প্রতিবাদ" কবিতার কথা উঠে আসে –

"গর্ভের সন্তান আর তারও পর যারা আসবে
আর যারা ইতিমধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে, বইখাতা নিয়ে স্কুল বিংবা কারখানায়
যে সব শিশু, বালক-বালিকা
স্বাধীন দেশেই যারা জন্মেছে, স্বাধীন দেশে জন্মাবে,
তাদের স্বাস্থ্য ঘরবাড়ি পড়াশুনা নিয়ে
তাদের মুখের ভাত নিয়ে এই খেলা … '

স্বাধীন স্বদেশ যেন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ আমাদের জন্মভূমি নিয়ে, আমাদের নগর, গ্রাম, খামার, কারখানা, দেশের সীমান্ত, দেশের ভিতর পোস্টাপিস, রেলগাড়ি, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, দেশের ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নাচ, গান, ছবি, নুন, আর রুটি নিয়ে অদ্ভুত খেলায় মত্ত, এই অদ্ভুত খেলায় সাধারন মানুষ প্রতিনিয়ত নিরন্ন, অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত। স্বাধীনতা লাভের ৭৩ বছর পরেও আমরা পুঁজিবাদীদের দ্বারা চালিত। সাম্যবাদী সমাজ ব্যাবস্থা আজও আমাদের কাছে স্বপ্ন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, "বীরেন্দ্র কবিতা লিখে গেছেন সরাসরি জীবনের জন্য, জীবনের তাগিদে তিনি কবিতা না লিখে পারেনি নি।" কাজী নজরুলের কবিতায় যেমন বিদ্রোহী স্বতা প্রবলভাবে ঘোষিত হয়েছে তেমন ভাবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রতিবাদ প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের সামনে হাজির হয়নি। তিনি প্রথমে পাঠক কে দেশ, সমাজ, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছেন; অতঃপর ধীরে ধীরে পাঠক কে তাঁর কবিতা পঠনের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী মনস্ক করে তুলেছেন। স্বদেশকে তিনি তুলনা করেছেন নিরন্নের দেশ, উলঙ্গের দেশ বলে। যেখানে মানুষ নিরাশ্রয়, হাত-পা ভাঙা, বোবা, মুখে রক্ত তোলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নেড়িকুত্তা, দূর থেকে লেজ নাড়ে আর দয়া ভিক্ষা চাই ইতর মন্ত্রীর কাছে, তাঁর পোষা সর্দারের কাছে নতজানু হয়। সমসাময়িক স্বদেশের চিত্র ' গুলি চলছে' কবিতায় অপরুপভাবে ফুটিয়ে তোলেন কবি –

"গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে – এই না হলে শাসন?
ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বন্'ধ
গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই !
……
গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই !"

তৎকালীন স্বাধীন ভারতের রাজধানী কলকাতার বুকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে কবি ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন "**একেই বলে গণতন্ত্র: এরই জন্য কবিতার সর্দার সাহিত্যের মোড়লেরা কেঁদে ভাসানঃ"** যেসব মানুষ প্রাণ থাকতে অন্যায়ের কাছে মাথা নত

করেনি; শাসকের রক্তচক্ষু দেখে ভয় না পেয়ে গর্জে উঠেছে; সেই সব মানুষদের আহ্বান করেছেন কবি। জরাজীর্ন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে, নতুন প্রত্যয় নিয়ে আগুনে পুড়ে... দীপ্তিমান নবজাতক হয়ে সর্বহারা মানুষের গান করতে চেয়েছেন কবি। আর তাই নতুন প্রত্যয় কবিতার দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

"সর্বহারার শৃংখল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই
কিন্তু অর্জন করার আছে-
পুরোনো বস্তাপঁচা বিশ্বাস গুলির বিপরীত
কোন নতুন প্রত্যয়, যা একদিন মানুষকে সত্যিকারে ধর্ম শেখাবে।

যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম যে মাটিকে আশ্রয় করে আমি বড় হয়ে উঠেছি, যাকে আমি শুধু দেশ না ভেবে মা-এর সম্মান দিয়েছি; যে জন্মভূমিতে আমি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষা দিতে চাইছি; সেই দেশেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ মানুষের অবস্থান কোথায়? তা "আমি যখন শূন্যে ঝুলে থাকি" কবিতার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে-

ছোটবেলায় আমি ছিলাম
পরাধীন দেশের বোকা মানুষ,
তখন আমার মাথার উপর
আকাশ বলতে কিছু ছিল না ।
বড় হয়ে এখন আমি
একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক,
এখন আমি 'অ-আ-ক-খ পড়তে জানি
লিখতে জানি। অথচ কোন স্বাধীন দেশেই-
আমার পা রাখার জায়গা নেই।"

আর এই পা রাখবার ব্যবস্থা করতেই তিনি রচনা করেকছিলেন একের পর এক প্রতিবাদী কবিতা। সমাজের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে তিনি দায়বদ্ধ হয়ে কলম ধরেছিলেন। তার কবিতায় দেশপ্রেমের পাশাপাশি ছিল অসহায় দরিদ্র জনগণের ক্ষুধাতুর পিপাসার আর্তনাদ। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যারা এক মুঠো ভাত সংগ্রহ করতে পারছে না তাদের উদ্দেশ্যে 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতায়-

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ, রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজও ভাত রাধে
ভাত বাড়ে ভাত খায়।
আর আমরা, সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে, প্রার্থনায় সারারাত।

পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ স্বাধীন দেশে ফুটপাত হয়েছে অসংখ্য মানুষের বাসস্থান। বস্ত্রের অভাবে শিশু আজ ন্যাংটো, শিশুর মুখে খাবার তুলে দিতে না পারায় মা লুকিয়ে মোছেন চোখের জল, "ফুটপাতের কবিতা'য় "**ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়/ যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা"**। বিপন্ন এই স্বদেশ, বিপন্ন স্বদেশের মানুষ, যারা শত শতাব্দীর শ্রমে, পরিচ্ছন্ন সততায় মানবিক শুভেচ্ছায় নতুন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছে; আর সেই সমাজে কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে, চাষী, শ্রমিক সবই একযোগে কাজ করবে, নিয়ে আসবে সবুজ ফসলে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ- কোথায় তাদের মান? এমনকি-

"কোথায় তাদের ঘর? ত্রিপুরায়, আসামে বাংলায়,
সাঁওতাল পরগনায়, দক্ষিণাত্যে মেঘালয়। ঘর কোথায়?
পাহাড়ে, জঙ্গলে চা-বাগান্ কয়লা খনিতে, (অথচ ভারতবর্ষ তাদের)"

কবি পাঠক কে যেন প্রশ্ন করেছেন- দেশ থাকতে তাদের দেশ নেই কেন? কেন তারা কুঁজো হয়ে কাজ করে, আধপেটা খাই বিনা চিকিৎসায় মরে; কিংবা কপালের জোরে বেঁচে থাকে । মনুষ্যত্বের এই নিদারুণ অবমাননা থেকেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছিলেন যতদিন স্বদেশ হবে পুঁজিবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শাসক হবে শোষকের যন্ত্র, বিচারক হবে অন্ধ, শিক্ষা হবে

অর্থনীতির গোলাম, দেশর নেতা হবে স্বার্থপর ততদিন সমাজ ব্যবস্থায় থাকবে বৈষম্য। কুশবিদ্ধ শরীরটাকে যারা পেরেক দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে তাদের কিছু আসে যায় না। আজকের কিছু মানুষ ভুলে গেছে মানবতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাদের কাছে যত হত্যা তথ্য জয়। এই প্রসঙ্গে 'নরক' কবিতায়-

"কেননা হত্যায় সত্য, হত্যা ধর্ম। কে মারে এবং কাকে মারে, এই নষ্ট
চরিত্রের ভিড়ে কেউ নেই হিসেব নেবার। শুধু হত্যা চাই।
শতে শতে হাজারে হাজারে বালক-বালিকা শিশু পরস্পরের মৃতদেহ মারিয়ে
এ-ওর রক্তে হাতের নিশান লাল থেকে আরও গভীর, ... "

ক্ষমতাশালী মানুষদের হাতে বলি হচ্ছে লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষ। যেন কেউ মন্ত্রী হয়ে এই সব মানুষের প্রেম, মানবতা কিনে নেয়। সাধারণ মানুষদের পশুর মত বধ করে আহ্লাদিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কিভাবে সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের অস্তিত্বকে হীন করে দিচ্ছে তার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে' কবিতায়-

"কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ-ফুট জমি নেই। "

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের কথা তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। কৃষক, শ্রমিক, শিশ্ যুবক - যুবতী, শিক্ষক-ছাত্র, ডাক্তার, পুরোহিতগণ, মন্ত্রী-আমলা, পুলিশ, গুপ্তচর, খুনি, গুন্ডা, সাংবাদিক এমনকি বেশ্যা ও বেশ্যালয়ের কথা পর্যন্ত। সমসাময়িক রক্তাক্ত ঘটনাকে তিনি উপেক্ষা করেননি; যা ঘটেছে, এমনকি যা ঘটতে পারে, তার আভাসও দিয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্যে। চারিদিকে মানুষের সীমাহীন লোভ, রাস্ট্রদম্ভে স্ফীত বৃকোদর দানবদের স্বেচ্ছাচারিতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তাই কবি রোমান্টিকতার মোড়কে কবিতার গন্ডীকে সীমিত না রেখে যুগযন্ত্রনার বিপন্ন মানুষদের কান্নাকে ভাষা দিয়েছিলেন কবিতার আকারে। এ প্রসঙ্গে 'উত্তর পাড়াঃ কলেজ হাসপাতাল' কবিতাটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে-

রক্ত রক্ত শুধু রক্ত, দেখতে দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়
শিক্ষক-ছাত্রের রক্তে প্রতিটি সিঁড়িতে, ঘরে, চেয়ার্ চৌকাটে,
বারান্দায়ে ...
এই তোমার রাজত্ব খুনি! তার ওপর কি বাঁহবা চাও?
আমরাও দেখব, তুমি কতদিন এইভাবে রাক্ষস নাচাও!

সামাজিক অবক্ষয় বহমান সময়ের দাবি স্বীকার করে দেশভাগের যন্ত্রনা হৃদয়ে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতা রচনায় হাত দিয়েছিলেন। যদিও প্রথম জীবনে কবি প্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রেম দিয়েই তো সব মানুষের জীবন শুরু হয়। কিন্তু বীরেন্দ্র ছিলেন মানবতাবাদী; তাই যখনই তিনি মানবতার অপমান দেখছেন, প্রচলিত রোমান্টিক প্রেমকে সরিয়ে তখনই তার প্রতিবাদী কণ্ঠ থেকে অগ্নুৎপাত বেরিয়ে এসেছে। প্রেমকে করে তুলেছেন দহনের শক্তি, পরিবর্তিত সৌন্দর্যবোধ ও বৈপ্লবিক চেতনা সমৃদ্ধ। প্রান্তিক, বঞ্চিত, অবমানিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে চেয়েছেন। উৎপীড়িত আপামর জনসাধারণকে কবি বোঝাতে চেয়েছেন কোথায় যাবো? এই পৃথিবী আমার, আমাদের। তোমরা যতই মারো এই জন্মভূমি ছেড়ে যাবো না কোথাও। কার পাপ এ রক্তের ভিতরে যে আমরাই হব শুধু বঞ্চিত। কোন একদিন আসবে যখন আসমান ছেয়ে যাবে পতাকায়, ফেস্টুনে, গর্জনে মনে হবে দৃশ্যের দর্পণে বুঝিবা দ্রুত পৃথিবী বদলাবে। 'রম্যাঁ রলাঁ: মানুষের নাম' কবিতাটি প্রাসঙ্গিক এক্ষেত্রে-

"...আমরা কর্তব্য শিখি - স্বদেশের
নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, পবিত্র সংবিধান, আইন স্বাধীনতা
স্বদেশের নিরাপত্তা
স্বদেশের... নিরন্ন দেশে, উলঙ্গের দেশে
সত্যি কারের মানুষের নাম আমাদের মুখে আজ... "

বাস্তব জগতে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কোটিপতি হওয়া নয়, আলিসান প্রাসাদে ঘুমানো নয়, সোনার থালায় নানাবিধ ব্যঞ্জনের পরিপূর্ণ অন্নভোজন নয়; তাদের কামনা দুই বেলা দু-টুকরো পোড়া রুটি । এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক 'রুটি দাও' কবিতাটি-

"এ এক মন্ত্র! রুটি দাও রুটি দাও,
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাওঃ
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা। '

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে দেশের সাধারণ মানুষ যখন রুটি, ভাতের জন্য শহরের রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিল তখন কবি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মানুষ আগুনের পথে হাঁটছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' ছোট গল্পের প্রধান চরিত্র মৃত্যুঞ্জয় দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে একা দাঁড়িয়েছিল, নিজের মাইনের সমস্ত টাকা রিলিফ ফান্ডে দিয়ে, নিজের পরিবারের খাদ্য দিয়ে; কিন্তু অসংখ্য ক্ষুধিত মানুষের ক্ষুধা মৃত্যুঞ্জয় নিবারণ করতে পারে নি, গল্প শেষে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন নিজে একাই সংগ্রাম করে এই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব না। তাই তিনি লেখনীর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করতে চেয়ে ছিলেন; প্রান্তীয় মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী, স্বার্থপর শাসকদের ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন তাঁর কবিতা দিয়ে, এ প্রসঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে-

"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার,
তোদের প্রাসাদে জমা হল
কত মৃত মানুষের হাড়,
হিসাব দিবি কি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি
সে কথা কি আমি কখনো
জীবনে মরনে ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার
যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে
তোদের চিতা আমি তুলবই। '

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন এক বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা শ্রমজীবী মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে নতুন এক ভারতবর্ষ গড়তে পারে। যে ভারতবর্ষে রাস্তা হবে সবার জন্য। কোন দ্বেষ, হিংসা, বৈষম্য থাকবে না। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সেই ক্রান্তিকালে, যখন কিছুদিনের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের গঠন ও তারপর সেই সরকারের পতন, নকশাল আন্দোলনের জন্ম, চারিদিকে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যা, পুলিশের ভয়ানক অত্যাচার, বেকারত্বে পরিপূর্ণ শহর-গ্রাম, জন-জীবন, বহু যুবকের তাজা প্রাণ অচিরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ যখন একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছে না; সেই মুহূর্তে প্রতিবাদী সত্তা নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একের পর এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়;- 'মহাদেবের দুয়ার'(১৯৭১), 'ওরা যতই চক্ষু রাঙায়' (১৯৬৮), নভেম্বর-ডিসেম্বরের কবিতা, (১৯৭১), 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা' (১৯৭৩), রাস্তায় যে হেঁটে যায়' (১৯৭২) মানুষখেকো বাঘেরা লাফায়' (১৯৭৩) ইত্যাদি যা সমসাময়িক সময়ে এবং বর্তমান সময়ে পাঠ্য হিসেবে যথাযথ। বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কবি। ব্যাংঙ্কে, সার্ভে প্রকল্পের কাজে, টিউশানি, স্কুল মাস্টারি প্রভৃতি; আবার তাঁর সাহিত্য জীবন ও গণবার্তা, ক্রান্তি, অরনি, অগ্রণী, কবিতা, পূর্বাশা, বসুমতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর ফলে তার জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ছিল বিস্তৃত। কবি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন- **আমার কবিতা কোনদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতার কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল সংগ্রহ করে নি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে, সেখানে আজও যারা জলসিঞ্চন করেছেন তারা সবাই দলছুট একক কবি- যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ।** 'একক এবং স্বতন্ত্র কবি হবার আকাঙ্খায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে কবিতার বিষয়বস্তু করেছিলেন। যেখানে শুধু শিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কবিতা রচনা করেননি; সমাজের উন্নয়নে কবিতা কে ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার রূপে। আর এখানেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমসাময়িক কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রাসঙ্গিকতায় নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের চাষিদের জমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে লিখিত মৃদুল দাশগুপ্তের 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতার কথা উঠে আসে-

'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
এখন যদি না -থাকি
কেন তবে লেখা, কেন গান গাওয়া
কেন তবে আঁকাআঁকি?'

সাম্যে আস্থাবান, সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং আশাবাদী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক সংকটকে, বেঁচে থাকার গ্লানিকে কবিতায় তুলে এনেছিলেন অনবদ্য মহিমায়। পরিমিত বোধ সম্পন্ন, অতিকথন বর্জিত কথন রীতিতে বিশ্বাসী, প্রশ্ন মুখর, প্রতিবাদী, বিদ্রুপ প্রবণ কবি তাই 'জন্মভূমি আজ' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন-

"একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।
এখনো রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর।'

স্বদেশের মূল শক্তিই হল মাটি এবং মানুষ। মাটি থেকে যে ফসল জন্মায় তা দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কৃষক ও মাটির উর্বরতা হলো স্বদেশের প্রাণের স্পন্দন। আর সে কারণেই মানুষ পারে মাটির আশ্রয়ে সভ্যতার সম্পদকে আরও উন্নত করতে। দেশ কাল এবং স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় কবির কাছে মাটি এবং মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে। মা এবং স্বদেশের প্রতীক হয়ে উঠে মাটি। অত্যাচারী শাসক শ্রেণী কে, মাটি ও মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে সরিয়ে দেবার প্রয়াস গ্রহণ করে তবে তা সম্ভবপর হবে। মাটি ও মেহনতী মানুষকে যে শাসকশ্রেণী অবহেলার চোখে দেখে; একমাত্র সাহসিকতা ও নির্ভীকতার দাঁড়াই তাদেরকে পরাজিত করা যাবে। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এর বক্তব্য এক্ষেত্রে পরিধানযোগ্য- **জীবন বিষয়ে বীরেন্দ্রর প্রবল দায়িত্ব চেতনা ও জীবন বাস্তবের নিগূঢ় দাবিতে ব্যক্তি প্রেম থেকে গভীর মানব প্রেমে তার উত্তরণ, অপরদিকে শান্তি ও শূন্যতা নিয়ে রোমান্টিসিজম। এই দুইয়ের সংঘাতে শেষ পর্যন্ত কবি হৃদয় জয়ী হল বাস্তব জীবন ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা।'**

বাস্তব জীবন ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা কবির মধ্যে প্রবল ভাবে ছিল বলেই, সমসাময়িক অরাজকতাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। আর এই কারনেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে যুব সমস্যার কবি বলা যেতে পারে। প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের ডুবে না থেকে যুগের প্রয়োজনে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ডঙ্কা বাজাতে, শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কলম হাতে নিয়েছিলেন। ন্যায়বান, বিবেকবান, সুন্দরের পূজারী হলেন কবিরা। খোলা বই-এর মত জগত ও জীবনকে পড়ে ফেলায় ক্ষমতা তাদের থাকে বলেই কবিরা হয়ে ওঠেন সত্যদষ্টা। আদর্শ কবিরা শুধু তাঁদের সমকালে নয়, ভাবীকালের রথের সারথি হয়ে নিজের বিবেককে জাগরুক রাখেন, মনুষ্যত্বকে অনির্বাণ রাখেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এর মধ্যেও আমরা খুঁজে পাই বিবেকের জাগরণ মানুষের মনুষ্যত্ব। আর যে কারণে কবি তার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-এর *(১৯৮০)* দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কবি স্বয় লিখেছেন- **শুধু বেঁচে বর্তে থাকায় তো একজন মানুষের অন্বিষ্ট নয়। নিজের ছোট্ট চিলে ঘরটিতে বসে একতারা বাজিয়ে সারা জীবন প্রেম আর ও প্রেমের গান গাওয়া- তাও নয়... অর্ধেক জীবন তো তার পায়ের নিচে কোন মাটিই থাকে না। তাহলে কি রকম রাস্তায় একজন মানুষের? একজন কবির?'** আসলে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সন্ত্রাসের নাটকীয় রূপ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অশান্তির আগুন। আর তাই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির পরিশুদ্ধিতার জন্য তাঁর রাস্তা হয়েছিল প্রতিবাদের। যে রাস্তায় হেঁটে কবি একদিকে অসহায়, উৎপীড়িত মানুষের কণ্ঠে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা ও তাদের পাশে সহমর্মিতা, সহানুভূতি জানাবার মানুষদের অন্বেষণ করতে চেয়েছেন; অন্যদিকে তেমনি স্বার্থপর মানুষদের মুখোশ খুলে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ও বিবেককে মনুষ্যত্বের আয়নায় প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন।

স্বদেশের বিপন্ন পরিস্থিতিতে জনগণের বিবেক ও মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখতে চেয়েছিলেন' কবি। তিনি অনুভব করেছিলেন মানুষের নৈতিক মূল্যবোধই পারে সুন্দর স্বতিময় সমাজ ব্যবস্থা গড়তে। আশাবাদী কবি তাই স্বদেশ প্রেমের মহিমায়, প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নবজীবনের গান গেয়েছিলেন। তারই প্রমাণ পাই "আন্তর্জাতিক প্রহসন নয়, সত্তিকারের পৃথিবীর জন্য" কবিতায়-

"একটা পৃথিবী চাই -
শুকনো কাঠের মত মায়েদের
শরীরে কান্না নিয়ে নয়
তাদের বুকভর্তি অফুরন্ত ভালোবাসার
শস্য নিয়ে।'

মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন কবি। জীবনের ও সমাজের সব সংকট, অস্বস্তি, অশান্তি, অসহায়তার অবসান ঘটাতেই যেন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল বাংলা কাব্য জগতে। কবি শঙ্খ ঘোষ তাই বলেছেন- **'সত্তর সালের অল্প আগে থেকে সমস্ত দশকজুড়ে জেগে উঠতে থাকে তার ক্ষুব্ধ মুখ্যচ্ছবি, সমস্ত ভন্ড তা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের বিবেক ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর বিরামহীন প্রতিবাদে। সেই প্রতিবাদে কাব্য রীতির অনেক পুরনো শর্ত নিশ্চয়ই ভেঙে ফেলেন তিনি, ভেঙে ফেলেন ছন্দ প্রতিমার অনেক প্রাক-সংস্কার, শিল্পিত কবিতা লেখা হলো না বলে ছন্দ বিলাপও করেন কখনওবা। নিরাভরণ ঘোষনার ভাষাই বা পথচলতি দৈনন্দিন রূঢ়তায় ছড়িয়ে দেন তিনি কবিতা, আর কবিতা বিচারের এক নতুন মানে তখন আমাদের তৈরি করে নিতে হয়। তাঁরই কবিতার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সামনে রেখে।** 'তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সমসাময়িক সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে আজও শ্রমজীবী মানুষের নতুন পৃথিবী গড়ার অন্যতম পথ ও পাথেয় হিসেবে আমাদের কাছে অনবদ্য ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা '- দে জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, মে, ২০১৯।
২) 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতা '- সম্পাদনা- পুলক চন্দ, দে জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০০।
৩) 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ' - তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ পুর্নমুদ্রণ- আগস্ট, ২০০৯।
৪) 'কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি '- জহর সেন মজুমদার, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।
৫) 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ' (আধুনিক যুগ, ১৮০০-১৯৬০)- ড. দেবেশ কুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৭।
৬) 'বাংলা কবিতা অনেক আকাশ '- 'তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ২০০৩।
৭) 'আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারা বৈচিত্র্য '- কৃতী সোম, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ১৪১২।